ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

বাংলার সমাজ ব্যবস্থা নিরীক্ষণে নজরুল

মোঃ মাহমুদ হাসান*

Social Intrepretation of the Society of Bengal by Nazrul

Md. Mahmud Hasan

Abstract : Kazi Nazrul Islam, the rebel poet of Bengali Literature not only wrote poetry, rather he talked about the complex social relations of the existing society. He identified the problems of the then Indo-Bangladesh society and state. He is the first man who boldly demanded the total independence of this sub-continent in his writings and as a result of it, the British Government of India put him into jail. Nazrul, the brave and indomitable lion, did not care for it; furthermore, he advocated for the emancipation of the colonized Indian people and, for which, he won the hearts of the common people gaining enormous esteem, love and reputation. He did not disclose his windows of thought like the social thinkers, but a good number of his writings coincides with the theme and idea of sociological phenomena, for example, communal harmony, caste system, social inequality, colonial exploitation, underdevelopment of the society of Bengal. He pointed out the critical ideas in another form stressing the need for solidarity among the communities of India, specially, the two big communities, Hindu and Muslim. In this article it has been attempted to explore and observe sociological thinking of Nazrul with special reference to the society of Bengal.

* মোঃ মাহমুদ হাসান, উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

বহুমুখী প্রতিভা, গুণ ও লেখনীশক্তির অধিকারী নজরুলের লেখার একটা বিরাট অংশে সমাজ বিশ্লেষণ, ঔপনিবেশিক সমস্যা, সামাজিক বর্ণপ্রথা, সামাজিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়, সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন এবং সামাজিক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের জাল বিশ্লেষণসহ উপর্যুক্ত বিষয়ে যুক্তিযুক্ত সমাধানের সুপ্রচুর প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। মনে হতে পারে যে, অধিকাংশ কবিই তো কল্পলোকবিহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং তাঁদের রচনার সাহিত্যমূল্য সমাজ বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন ও অপ্রযুক্ত। উপর্যুক্ত বক্তব্যের অসত্যতা নির্ণয় করা হয়ত আপাতদৃষ্টে বেশ কঠিন; কিন্তু যিনি একই সাথে দার্শনিক ও কবি, সমাজকর্মী ও লেখক, সংস্কারক ও দিশারী তাঁর বেলায় একথা সত্য যে, সমাজ বিশ্লেষণে তিনি পারদর্শী ও সক্ষম। বরং তিনি সমসাময়িক সমাজ বিশ্লেষণে অতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন। কবিতার জন্য, লেখার জন্য কারাবরণ ও কারা নির্যাতন অতি উজ্জ্বলভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, নজরুল কবি হয়েও আপাদমস্তক একজন মাটির মানুষ, তিনি এ সমাজের জ্বালাময়ী বক্তা। তিনি যখন সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের ডাক দেন, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কথা বলেন তখন তাঁর কথা সমাজ পরিবর্তনের এক বিশাল দিককে নাড়া দেয়।

সমাজতত্ত্ব ও লেখক ঃ

Man is by nature a social and political animal. He, who does not live in a society, is either a beast or a god. এ্যারিস্টটলের এ কথার ওপর মনে হয় কোন বিতর্কই ধোপে টেকে না। আর এ জন্যেই মানুষ তার সামাজিক প্রয়োজনে সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে বহুবিচিত্ররূপে, শতধারায়। সমাজচিন্তানায়কগণও যুগে যুগে দেশে দেশে তাই সামাজিক বাস্তবতানির্ভর প্রপঞ্চসমূহের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব মূলত সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক বিজ্ঞানের স্বরূপের গিঁট উন্মোচন করতে গিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার সমাজচিন্তকদের এক দিকপাল ম্যাক্সওয়েবার বলেন, Sociology is a science which attempts the interpretative understanding of

social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its cause and effects.

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক চিন্তাতত্ত্বমূলক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ঘটনার কার্যকারণসূত্র আবিষ্কার করা। যিনি সমাজের সচেতন চিন্তক বা লেখক তিনি অবশ্যই চোখ বুজে বসে থাকবেন না, বরং তিনি তাঁর সামনের বিদ্যমান সমাজবাস্তবতাকে টেনে আনবেন। এটাকে লেখকের সামাজিক দায়িত্ব বলা যেতে পারে। বিশ্বের বিদগ্ধজনদের লেখার মধ্যে এ অনুভূতির প্রবণতা উজ্জ্বলভাবে লক্ষ্যণীয়।

প্রশ্ন হতে পারে, কবি সাহিত্যিকরাও এ সামাজিক দায়িত্বের দায় পালনে অনিবার্যভাবে বাধ্য কিনা। কেননা, কবিরা তো সমাজরূপ ফুলবাগানের মুক্তবিহঙ্গ, আপন মনের আনন্দে তাঁরা অনুভবের রাজ্যে বিচরণ করেন। কিন্তু আধুনিক যুগমাত্রিকতা কাব্যে সমাজভাবনার একটা স্থান করে দিয়েছে। আর তাই দেখা যায় যাঁরাই এ সমাজ সচেতনতার আদলে নিজেদেরকে প্রকাশিত করেছেন শিল্পের সকল কলাকৌশল ও দাবীকে দিব্যি রেখে, কাব্যের উৎপ্রেক্ষাময় কল্পলোকবিহার তাঁদেরকে বঞ্চিত করেনি; সমাজ, সময় ও বাস্তবতা তাঁদেরকে রাজটীকা দিতে দ্বিধা করেনি, বরং জাতি তাঁদেরকে নির্বাচিত সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

সমাজ নিরীক্ষণ ও নজরুল ঃ

কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যের একজন Major poet বা বড় কবি। বাঙলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তিনি দক্ষতা ও মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সামাজিক চিন্তাধারার রাজ্যে তাঁর ভূমিকা একজন সমাজতাত্ত্বিকের মত নয় একথা সত্য, সে পথ তিনি বেছেও নেননি; কিন্তু কবি ও লেখক হিসেবে সামাজিক দায়িত্বশীলতার যে পরিচয় আমরা তাঁর রচনাসমূহে পাই, তা সত্যিই প্রাণপ্রচুর, উদ্দীপ্ত ও দুর্লভ। একথা বলা মনে হয় অসমীচীন হবে না যে, কবি হিসেবে কল্পলোকবিহারের ব্যাপারটা বাদ দিলে তিনি আপাদমস্তক একজন সামাজিক কবি। তাঁর কল্পলোকবিহার তাঁর কাব্যের মূল সুর হয়ে ওঠেনি; স্বপ্নময় অনেক উপত্যকা তিনি ঘুরেছেন কিন্তু সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেননি, ফিরে এসেছেন ধূলির ধরার মানব

সমাজে। বাংলার মানুষ ও সমাজের সমস্যা, সমস্যার স্বরূপ এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে সাজিয়েছেন; ফলে তিনি একজন সমাজবাস্তবতা নিরীক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি হয়ে উঠেছেন সমাজের কবি, মানুষের কবি।

নজরুল ইসলাম স্বজাতি, স্বকাল, প্রবহমান সামাজিক-রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাগুলোকে তাঁর রচনার উপাদান বানিয়েছেন অবলীলায়। সমসাময়িকতাকে তিনি বিচিত্ররূপে মনোমোহন নৈবেদ্যে পরিবেশন করেছেন। তিনি পরাধীন ভারতের তথা বাংলার সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং তার নিদানও নির্দেশ করেছেন। কবি হিসেবে তাঁর এ অসামান্য ভূমিকা তৎকালীন সাহিত্যিকদের বা সমালোচকদের কারো কারো দৃষ্টিতে বিরূপভাবে সমালোচিত হয়েছিল। একদল রবীন্দ্রানুসারী তাঁর নিকট এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এদের পাত্তা দেননি, বরং নজরুলের যুগমানস প্রতিফলিত রচনাকে অভিনন্দিত করেছেন, আশীর্বাদ দিয়েছেন।

নবজাগৃতির চিন্তাধারা ঃ

পুরাতন ও জরাগ্রস্তকে পিছনে ফেলে নতুনের উদ্বোধন করার ওপর নজরুল বারবার গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ, তাঁর মতে পুরাতন সমাজের অভ্যন্তরে নবসৃষ্টির প্রসববেদনা আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, পুরাতন সংস্কার ও বিশ্বাস সামাজিক গতিশীলতার পথ রুদ্ধ করেছে এবং স্থবিরতা ও জড়ত্ব আনয়ন করেছে। এজন্যে তিনি কাল বৈশাখীকে নতুনের প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাসে' সে আভাস দিয়েছেন এভাবে ঃ

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন উড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে এভাবে নাড়া দিতে চান বলে প্রথমেই এভাবে তাঁর আবির্ভাবকে নির্দেশ করেছেন। নজরুল যে সময় আবির্ভূত হন সে সময় এ উপমহাদেশ বৃটিশের শাসন-শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট ছিল। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা ও আত্মজাগৃতি ব্যতীত সমাজ ও দেশের তথা মানুষের সার্বিক মুক্তি আসতে পারে না বলে তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে কলম চালালেন। একদিকে প্রাচীন সমাজের অভ্যন্তরস্থ জরাজীর্ণ মূল্যবোধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পঙ্কিলতা, সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছিল, অপরদিকে ইংরেজের দাসত্ব ও অধীনতা মানবমনকে আরো পঙ্গু, সংকীর্ণ ও অনুদার করে রেখেছিল। স্বাধীন চিন্তাধারা উন্মেষের জন্য এবং বদ্ধ, জরাজীর্ণ সমাজকে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তিনি পথ নির্দেশ করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, পুরাতনকে দিয়ে বিপ্লবাত্মক ও সৃষ্টিধর্মী কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়, কারণ ওরা পশ্চাৎমুখী। তাই তিনি নবশক্তি, নবসৃষ্টি ও নতুন জীবনধর্মী পরিবর্তন আনয়নের জন্য তরুণের ও যৌবনের শক্তিকে শনাক্তপূর্বক তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে এসে তাদের নির্ধারিত সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে আহবান জানালেন। তিনি বাংলার যুবশক্তি ও ছাত্রশক্তিকে আহ্বান করলেন ঃ

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়বাদল।
আমরা ছাত্রদল।।
মোদের আঁধার রাতে বাঁধার পথে
যাত্রা নাঙা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়।
যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল।।

(ছাত্রদলের গান)

এখানে কর্মনীতি হিসেবে তিনি বলেছেন যে, জ্ঞান হবে চলার পথের আলোকবর্তিকা। এই আলোতে তরুণ শক্তি সম্মুখের পথ দেখে চলবেন। কিন্তু নতুন সৃষ্টির জন্য তাকে রক্ত দিতে হবে, অনেক কিছুই ধ্বংস করতে হবে। সেজন্য তিনি প্রথমে ধ্বংসকে আহবান জানাচ্ছেন ঃ

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন,
আসছে নবীন জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!

(প্রলয়োল্লাস)

ধ্বংস না হলে যথার্থ নতুন সৃষ্টি হবে না বলে তিনি যুবশক্তিকে উদাত্তকণ্ঠে আহবান জানাচ্ছেন ঃ

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্।।
নব জীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ।
বাহুতে নবীন বল।
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহবান
ভাঙ্‌রে ভাঙ্ আগল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্।।

(চল্ চল্ চল্)

এটি একটি শক্তির মন্ত্র, শক্তির উদ্বোধন; অপরদিকে মৃত্যুর আহবান ও ধ্বংসের ডাক এবং এরই পাশাপাশি নতুন সৃষ্টির প্রসববেদনা। এক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবিতায় এক বিদ্রোহী আমিত্ব সত্ত্বার চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন। এ আমিত্ব কোন ব্যক্তিগত আমিত্ব নয়। এ আমিত্ব হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার ও নবসৃষ্টির শক্তিসাধনার সার্বজনীন দুর্বিনীত আমিত্ব। এ আমিত্ব যুবশক্তির মধ্যে বিস্তারলাভ করলে অন্যায়, অনাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, উৎখাত হতে বাধ্য। কারণ এ আমিত্বের মধ্যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা তাই তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্রোহের প্রকাশ নয় বরং এটা হচ্ছে অনাসৃষ্টির প্রতিবাদে নবসৃষ্টির ক্ষমতায় সমর্পিত এক বিশ্বজনীন উপকারী আমিত্ব। এজন্যে দেখা যায় তাঁর বিদ্রোহী কবিতা কোন নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রকে ঘিরে আবর্তিত নয়, বরং তা সর্বব্যাপী চারিত্র্যস্বভাবে মহিমান্বিত যা তাঁর রচনার সময় থেকেই শুধু নয়, অনাগত ভবিষ্যতের বিশ্বসাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ।

নজরুল যৌবনশক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি যৌবনের ও বার্ধক্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শুধু বয়স দ্বারাই তরুণ হওয়া যায় না। যার বয়স তারুণ্যকে স্পর্শ করেছে তিনিই তরুণ নন, বরং মনের শক্তিকে তরুণ্যের মাপকাঠি হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে বার্ধক্যও বয়স বেশি হওয়ার ফলাফল নয়। তিনি তাঁর ভাষায় বার্ধক্য ও তারুণ্যকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন ঃ

বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব-মানবের অভিনব জয়-যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচ-কাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কংকালসার - বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা

যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি - যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কংকাল-মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি -- যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন।

(যৌবনের গান)

সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ (দারিদ্র, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, সাম্প্রদায়িক সংকট, ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর মুখোশ উন্মোচন) ঃ

একজন সমাজ বিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে সমাজের সমস্যা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা। নজরুল ইসলাম তা করেছেন। তিনি তাঁর সময়ের প্রধান তিনটি সমস্যা, দারিদ্র বা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণশৃংখল এবং জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির সমস্যাকে তাঁর কাব্যে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁর ভূমিকা সমাজবিজ্ঞানীর মত। সস্তা সমালোচকরা তাঁকে যুগের কবি, চারণ কবি বলে চিহ্নিত করেছে, তাঁর অন্তর্নিহিত কাব্যবিচার ও সমাজমনস্কতাকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু কবি জানতেন, যারা সমাজ বিনির্মাণ করবে তারা ঘুমিয়ে আছে। তাদেরকে জাগাতে হবে; তাই নবযুগের সানাই বাঁজাতে তিনি এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে মোটেও অসচেতন ছিলেন না। সমসাময়িকতার কালোত্তীর্ণতাকে অন্তর্দর্শন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলে জীবনদর্শনকে কী সহজ সাবলীল ভাষায় উচ্চারণ করেন যেখানে ধ্বংস ও সৃষ্টি পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে ঃ

আমি হোমশিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য;
.....।
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সববাঁধ।

(বিদ্রোহী)

নজরুল সামাজিক অনুষঙ্গে কী রকম জ্বলে উঠেছিলেন, কী রকম নিবেদিতপ্রাণ মসীযোদ্ধা হয়েছিলেন, বিদ্রোহী, ধুমকেতু, প্রলয়োল্লাস, সাম্যবাদী, সর্বহারা, কান্ডারী হুঁশিয়ার, কুলিমজুর, ফরিয়াদ মানুষ প্রভৃতি কবিতা থেকে তার প্রমাণ মেলে। চতুর্দিকে সামাজিক অসংগতি ও শোষণ চলছিল। কবি হিসেবে শুধু নয়, সমাজের একজন সচেতন মানুষ হিসেবে তাই এসব অসংগতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে চিহ্নিত করাকে তিনি পবিত্র কর্তব্য হিসেবে মনে করেছিলেন, যেজন্যে তিনি কোন অপরিণত, অযথার্থ ও বিরুদ্ধ সমালোচনাকে পরওয়া করেননি। তিনি বারবার সমাজের মানুষের কাছে ফিরে গিয়েছেন।

যেখানেই অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য, শোষণ ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ দেখেছেন, সেখানেই তার প্রতিবাদ করেছেন। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি নিরাপোষ যোদ্ধা সেজেছেন এবং সে জন্যেই তিনি "বিদ্রোহী" কবি আখ্যা পেয়েছেন। নজরুলের সামাজিক দায়িত্ব পালন ও সমাজ সংশ্লিষ্টতার পরিচিতি এ বিশেষণ দ্বারাই জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। জুলুমের অবসানে তাঁর কী সম্পন্ন জীবনচেতনার ঘোষণা ঃ

আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে।

মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না --
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না --
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

(বিদ্রোহী)

নজরুলের পূর্বেকার কোন লেখকের লেখার মধ্যে এরূপ সামাজিক অঙ্গীকার স্থানলাভ করেনি। এ দ্ব্যর্থহীন বজ্রঘোষণা কবিকে চিরকাল যুগ-স্রষ্টার আসন দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের জগতে তিনি নবতর এক ধারা এনেছেন যাকে পরবর্তী কবিরা এড়াতে বা অস্বীকার করতে পারেননি, বরং নজরুল

চিন্তাসাগরে অবগাহন করেছেন এবং করছেন। তিনি তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করেছেন, তার বাইরে থাকেননি, আবার তাতে একাকার হয়েও যাননি। তিনি কারাবরণ করেছেন সত্যের জন্যে। মানুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি দুর্ভোগের পরিণামচিন্তা করেননি। সমাজের কল্যাণচিন্তা, জাতির স্বাধীনতা, স্বকীয়তা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানে তিনি সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যখন বলেন ঃ

আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য;
বল বীর
চির উন্নত মমশির!

(বিদ্রোহী)

ধর্মীয় চিন্তায় নজরুল ঃ

একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তিকে, যিনি সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী, অবশ্যই সামাজিক নানাবিধ সম্পর্ক অধ্যয়ন করে তার নির্যাস বের করে আনতে হয়। সমাজ যেহেতু জটিল সামাজিক সম্পর্কের জাল দ্বারা আচ্ছাদিত সেহেতু সামাজিক সম্পর্কের পাঠোদ্ধার ও মর্মোদ্ধার করা তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস যেখানে সামাজিক সম্পর্ক এক বিচিত্রমুখী ও বহুরূপী চারিত্র্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এখানে হিন্দু-মুসলিম দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় ব্যতীত আরো অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে। বলা অসমীচীন হবে না যে, এক হিন্দু সমাজে যে বর্ণপ্রথা বিরাজমান রয়েছে তার বদৌলতে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে বহুবিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাতজ্ঞান, ভেদজ্ঞান, ছোঁয়াছুঁয়ি ও অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যে নানা সম্পর্ক তৈরি করে রেখেছে। নজরুল যেহেতু অবিভক্ত ভারতের নাগরিক হিসেবে নিজেকে পেয়েছিলেন, সমাজ নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের বেলায় তাই তিনি ভারতীয় অবিভক্ত বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তাঁর রচনার উপাদান খুঁজে নিয়েছেন। তিনি মুসলিম সমাজের

গোঁড়ামী, কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা ও সামাজিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান যেমন করেছেন, তেমনিভাবে করেছেন হিন্দু সমাজেরও। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মুসলিম সমাজ অপর বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দুদের থেকে শিক্ষাদীক্ষায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও সংস্কৃতিতে অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। কেন এই পশ্চাৎপদতা ? যখনই তিনি তার কারণ অনুসন্ধান করতে যান ততবারই তিনি বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতাকে টেনে আনতে গিয়ে জড় ও ক্লৈব্য মানসিকতা লালনকারীদের সমালোচনার শিকারে পরিণত হচ্ছেন। তাঁকে তখন একদল লোক কাফের ফতোয়া দিতে পিছপা হচ্ছেন না। আবার অনুরূপভাবে যখন তিনি হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী ও কুসংস্কারকে চিহ্নিত করছেন তখন যবন আখ্যা পাচ্ছেন এবং তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতাকে অনুধাবন ও অনুসরণজনিত পাঠপ্রক্রিয়ায় নামলেই সমাজের কোন না কোন অংগ সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই তাঁর সামাজিক ঘটনা পরিবীক্ষণোওর সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষিত ও বিশেষায়িত হয়েছে। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নজরুল কোন সমালোচনাকে পরওয়া করেননি, বরং যা তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে তা নির্দ্বিধায় ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলায় প্রকাশ করেছেন। সত্য বলার এ সাহস অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে এটি সামাজিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে সত্যকে দেখিয়ে দেয় এবং অপরদিকে লেখক তাঁর সামাজিক সংস্কারকের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন। নজরুল একই সাথে সমাজ সচেতন ও সমালোচক এবং অপরদিকে দায়িত্বশীল পর্যবেক্ষক ও সমাজসংস্কারক।

তাঁর বিখ্যাত *মানুষ* কবিতায় আমরা দেখতে পাই তিনি হিন্দু ও মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত স্বার্থপরতাকে উজ্জ্বলভাবে টেনে আনছেন ঃ

'পূজারী, দুয়ার খোল,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!'
স্বপ্ন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!
'জীর্ণ-বস্ত্র, শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, দ্বার খোল বাবা, খাইনি তো সাত দিন!

সহসা বন্ধ হল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!

.....

মসজিদে কাল শিরনী আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি!
এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজারির চিন,
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!
তেরিয়া হইয়া হাকিল মোল্লা, ভ্যালা হল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গোভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা ?'
ভুখারী কহিল, না বাবা! মোল্লা হাঁকিল - তা'হলে শালা --
সোজা পথ দেখ! গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা!

.....

মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!

.....

তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয়!

(মানুষ)

এ কবিতায় তিনি ধর্মের নামে স্বার্থপরতার ও ভন্ডামীর মুখোশ উন্মোচন করেছেন, মানবতার জয়গান গেয়েছেন। এখানে তিনি মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয় -- এ বিষয়টি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে সমাজের বিদ্যমান অসংগতিকে স্পষ্ট করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুল ধর্মের মহান শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। বিদ্রোহ করেছেন ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে। যেখানে পরাধীনতা, মানুষের দাসত্ব ও অপমান নিত্য প্রবল, আত্মজাগৃতি যেখানে তিরোহিত, মানুষ ও মানবতা যেখানে চিরলাঞ্ছিত সেখানে ধর্মের ভূমিকা হবে পৌরুষ পুনরুত্থানের, মানবতা পুনঃস্থাপনের। তাঁর কথায় ঃ

'কিসের ধর্ম ? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার জল ঝড়কে আমি

বাঁধবো, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে ফেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করবো। সব ছারে-খারে দিয়েও আমি বাঁচবো।

আমার আবার ধর্ম কি ? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেংগে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি ? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন-বাপ-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি ? দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি ?

মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি ? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি ? ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়- এই ভন্ডামী থেকে চলে আয়। তোরা বল, আমাদের আগে বাঁচতে হবে। কিসের শিক্ষা? কে শেখাবে ? দাস কখনো দাসকে শেখাতে পারে ? আমরা কিছু শিখবো না, আমরা কিছু শুনবো না; আগে বাঁচবো -- আমরা বাঁচবো।

(আমার ধর্ম)

হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে মিলন প্রয়াস ও সামাজিক সংহতির ওপর গুরুত্বারোপ ঃ

তিনিই একমাত্র বাঙালি কবি যিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত। এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অজস্র লেখা লিখেছেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন, দেবী বন্দনা করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, তাহলো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চমৎকার মধুর সম্পর্ক স্থাপন। তিনি নিজে মুসলিম হয়েও হিন্দু মহিলা বিয়ে করেন এবং স্ত্রীকে তাঁর ইচ্ছেমতো ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেন।

সামাজিক সংহতি ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানীরা এ জন্যে সংহতির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সংহতি রাজনীতি ও সার্বভৌমত্বের প্রহরী বলা যেতে পারে। নজরুল এ সংহতি বা ঐক্য

জোরদার করার জন্যে কবিতা লিখলেন, গান লিখলেন, প্রবন্ধ লিখলেন। সামাজিক ভেদ-বৈষম্য তৎকালীন সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, বিশেষত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ছিল। তিনি এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি, আস্থা, ও পারসপরিক সমঝোতা সৃষ্টির জন্যে কবিতা ও গান রচনা করতে থাকেন। 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় তিনি লিখলেন ঃ

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম"? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কান্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

বর্ণপ্রথার সমালোচনা ঃ

সামাজিক গবেষণায় দেখা যায়, সমাজ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। বিশেষত বাঙালি হিন্দু সমাজ বর্ণপ্রথা ও ছুঁতমার্গে বিশ্বাসী। বর্ণপ্রথার কারণে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে উঁচু-নীচু নানা ভেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এবং এর পরিণতি কখনো কখনো অতি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়। জাতের নামে ব্যক্তি ও সমাজকে খান খান করা হয়েছে এবং মানবতার অপমান করা হয়েছে বলে নজরুল মনে করেন। বর্ণপ্রথা ও তথাকথিত জাতের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ঃ

জাতের নামে বজজাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ-খান!
এখন দেখিস ভারত-জোড়া
পড়ে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া।।
জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল ?

(জাতের বজ্জাতি)

জাতবিচার করতে গিয়ে মানুষ আজ মরণের দিকে ছুটে চলেছে। তাঁর ভাষায় ঃ

এদিকে উচ্চজাতি মৃত্যুকালেও নিম্নজাতিকে এক ধাপ উপরে উঠতে দিবে না। জমিদারের জমি নিলামে, তবু সে প্রজার হাত ধরিবে না। বাবুরা ছোট লোকদের এখনও দূরে রাখিতেছেন। এ দেশী বড় লোকেরা ধর্ম সমাজ এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রেও আভিজাত্য ও কালচারের গর্বটুকু ভুলিতে পারিতেছেন না। সমস্ত জাতিটা যেন মরণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

.....

নিম্নজাতি - জাতির অধিকাংশ লোক যেখানে ছিল, বাবুর সমাজ তাহাদিগকে সেইখানেই চাপিয়া রাখিল। ..... নিম্নজাতির কথা বলাও যা, ভূতের কাছে রামনাম করাও তাই।

(লাঞ্ছিত)

মুসলিমদের প্রতি আহ্বান ঃ

নজরুল হিন্দু সমাজকে জানার জন্য মুসলিম সমাজের প্রতি আহবান জানান ঃ

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, আমরা সবার কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায় ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যানডিনেভিয়ান, চীন, জাপানী, হনলুলু গ্রিনউইচের ভাষা জানি ইতিহাস জানি। তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশির ঘর তারই কোনো খবর রাখিনে বা রাখার চেষ্টা করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয় Penny wise pound foolish. আমাদের Next door neighbour এর মন থেকে আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামিরও অবসান হবে সেইদিন যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে

Competition হবে সে competition হবে cultured মনের Chivalrous competition — sportsman like competition.

(মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা)

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে, এ দু'সম্প্রদায়ের মাঝে সদ্ভাব, সুসম্পর্ক গড়ে না উঠলে পরাধীন জাতি স্বাধীন হতে ব্যর্থ হবে এবং অন্যদিকে সামাজিক ভারসাম্য ও শান্তি বিনষ্ট হবে। তাঁর ভাষায় ঃ

হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব, অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষানস্তূপের মতো জমা হয়ে আছে -- এই অসাম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাজে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম -- আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর।

(যদি আর বাঁশি না বাজে)

তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এ চেষ্টা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম, তাঁর পরে আর কোন কবিকে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

শ্রমের মর্যাদা দান ও সাম্যবাদী চিন্তাধারা ঃ

যে শ্রমিক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সভ্যতার প্রতিটি ইমারত নির্মাণ করেন, নজরুল ইসলাম তাদের কথা চিন্তা করেছেন। শ্রম, শ্রমের মর্যাদা দান এবং নিপীড়িত মানুষের প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় উচ্চকিত। শ্রমজীবী জনতার প্রতি গভীর মমত্ববোধের কাব্যিক সন্দর্শন এ-ই প্রথম ঃ

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করিয়া জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?

.....

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

.....

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনে এক মিলনের বাঁশী।

.....

মহা-মানবের, মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।

(কুলি-মজুর)

নজরুল ইসলাম যে ধূলির ধরায় বাস করেছেন, মানুষের কত কাছে বাস করেছেন, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে কত নিগূঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও ভালবেসেছেন, তা এ থেকে অনুমান করা যায়। অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র দ্রোহ উচ্চারণ করেছেন। অর্থনীতি যে মানব জীবনের প্রধান নির্ধারক ভূমিকা পালন করে এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন বলেই অর্থনৈতিক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

তিনি সাম্যচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হলেন এবং সব নরগোষ্ঠীগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে ঘোষণা করলেন ঃ

গাহি সাম্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সবদেশে, সবকালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

(মানুষ)

কৃষক-শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে নজরুলের বক্তব্য ঃ

আপনারাই (কৃষক শ্রমিক) দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ। মাটির মায়ায় আপনাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই। রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া দিন নাই রাত নাই সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই ত এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয় সন্তানের মত লালন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনাদের মাঠের এক কোদাল মাটি লইলে আপনারা আততায়ীর হয় শির নেন কিম্বা তাকে শির দেন, -- এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর যে শস্য শ্যামল মাঠ, আপনারা আমার কৃষাণ ভাইরা ছাড়া অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষায় আকাশ ভরিয়া বাদল নামে ---------- এ মাঠ চাষার এ মাটি চাষার, এর ফুলফল কৃষক-বধূর।

(কৃষক শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ)

ইসলামী আদর্শবাদের উপস্থাপন ঃ

কবি হিন্দু-মুসলিম মিলনের বাণী প্রচার করেছেন যা অনেকেই সুনজরে দেখেনি। শুধু তাই না, অনেকে তাঁকে কাফের বলতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু তিনি এতে দমে যাননি। তিনি স্বজাতি-ধর্ম-সমাজ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মুসলিমরা তৎকালে সব ব্যাপারেই পিছিয়ে ছিল বলে তিনি তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন। তাঁর রচনার এক সিংহভাগ ইসলামী আদর্শবাদ ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। মূলত বিংশ শতাব্দীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে এ উপমহাদেশের বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর আন্দোলনে তিনিই অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন। মুসলিম জাতিসত্তার নয়া উদ্বোধক তিনিই। তিনিই প্রথম কবি যিনি মুসলিম জাতিসত্তার, ঐতিহ্যের ও আদর্শের সার্থক উপস্থাপক। তাঁর ইসলামী কবিতা ও গান আজো তুলনারহিত ঃ

উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা!
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক
শহীদের দিনে সব লালে লাল হয়ে যাক।

(মোহররম)

এভাবে ইসলামী জাগরণমূলক কবিতার অনেক উদাহরণ পেশ করা যাবে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁকে বাঙালি মুসলিম জাতিসত্তার প্রাণপুরুষ ও সার্থক দিকদিশারী বলা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক কবির মর্যাদায় আসীন। তিনি মাটির কোলে বেড়ে উঠে মাটি ও মানুষের কথা চিন্তা করেছেন, চিন্তা করেছেন সামাজিক অন্যায় ও অসত্যের প্রতিকারের কথা। সামাজিক সমস্যাকে তিনি কাব্যের উপজীব্য করেছেন। মোটকথা সকল সামাজিক অনুষঙ্গ একযোগে তাঁর রচনার মৌলিক বস্তুগত কাঠামো বিনির্মাণ করেছে। একজন সামাজিক বিজ্ঞানীর কাজও তাই। তিনি সব সময় সামাজিক সমস্যাকে উদ্‌ঘাটন করতে থাকেন। এটা তাঁর মূল দায়িত্ব। প্রতিকারচিন্তাও।

আমরা আগেই বলেছি, নজরুল তত্ত্বগত পদ্ধতির কোন তত্ত্ব দেননি, কিন্তু তত্ত্বের মূল সুরকে আত্মস্থ করে কাব্য রচনাতে তা প্রয়োগ করেছেন। এখানেই কবির মহত্ব। নজরুলের রচনা অর্থনৈতিক সুবিচারভিত্তিক সাম্যনীতির সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক। তবে সে সাম্যবাদী ব্যবস্থা কার্ল মার্কসীয় সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে বিনির্দেশ করে না, যদিও কবি রুশ বিপ্লবের পর পরই তাঁর অমর গ্রন্থগুলো রচনা করেন। তবে প্রভাব যে একেবারে ছিল না, তা নয়, ছিল। তৎকালীন ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল, ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের তৎপরতার সাথে যোগাযোগ। তাঁর সাম্যবাদী দর্শন অনেকাংশে ইসলামী

দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। নজরুলের সুবিধা ছিল এই যে, তিনি সব মতাদর্শের সাথে পরিচিত থেকে অন্তর্দৃষ্টির অভিক্ষেপণ প্রয়োগে নিজস্ব চিন্তাধারার ভুবন তৈরি করতে পারতেন। করেছিলেনও তাই।

নজরুলের সামাজিক কর্মসূচী ঃ

অগ্নিবীণার বিদ্রোহী, প্রলয়োল্লাস, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, সাম্যবাদী, সর্বহারাসহ অসংখ্য সুবিখ্যাত কবিতা আর শেকল ভাংগার গান লিখে নজরুল বাংলা সাহিত্যাকাশে এক অসম্ভব আলোড়ন ও তোলপাড় তুললেন। নজরুলকে হিন্দু-মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে এলবার্ট হলে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে সংবর্ধনা দেয়া হলো। সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি নাড়া দিলেন এক হ্যাচকাটানে। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ নিরসনে অনর্গল লিখতে লাগলেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেও ক্ষান্ত হলো না, তাঁর লেখা বাজেয়াপ্ত করল। কিন্তু নজরুল নিজের দেশ-কাল-সমাজ-জাতিকে চিনেছিলেন এমনভাবে যে সমাজের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্তব্ধ হতে চাইলেন না। তিনি বৃটিশ সরকারের শাসন, তাদের সৃষ্ট দেশী-বিদেশী আমলাতন্ত্রের কাঠামোকে বৃটিশের দাসত্বের এক সুশৃঙ্খল চেইন বলে শনাক্ত করলেন এবং পাশাপাশি দেশীয় বৃটিশ তাবেদার শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের তুবড়িবাজি নিরীক্ষণ করে এদের অসারতা সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চিত হলেন। তিনি দেখলেন তাঁর ডাকে মানুষ সাড়া দিলেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় তারা অংশ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ চিন্তা থেকে নজরুল দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে আপামর জনগণকে তাতে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপাত্র হিসেবে তিনি 'লাঙল' পত্রিকা বের করেন।

এ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হলো যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্যলাভই দলের উদ্দেশ্য। কি উপায়ে সে উদ্দেশ্যে সাধিত হবে ? বলা হলো যে, নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগ উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হবে। দেখা যাচ্ছে তিনি

নিয়মতান্ত্রিক নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগকেই দলের লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিলেন। কোন সন্ত্রাসবাদ, অসহিষ্ণুতা, অগণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ তাতে নেই। বিদেশী আমলাতন্ত্র দ্বারা যে সমাজের কোন লাভ হবে না তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং এ বিবেচনায় দলের ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত সম্মতি ব্যতীত সরকারের অধীনে দলের কোন প্রতিনিধির চাকুরি গ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়।

দলের কর্মনীতি ও সংকল্পের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জমিতে কৃষকের স্বত্ব ও স্বার্থ ঘোষণার দাবী। তাঁর মতে ভূমির স্বত্বে স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বত্বাধিকার বা মালিকানা না থাকলে অন্য সমস্ত অধিকার ভোগে সুখ আসতে পারে না এবং ভুমির স্বত্বাধিকার ব্যতীত এর শুধু ভোগাধিকার ভূমিস্বত্ব ক্রীতদাসত্বের আইনসঙ্গত নামান্তর মাত্র। বলা বাহুল্য, দেশ ভাগের পরে ১৯৫০ সালে এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টেন্যান্সি এ্যাক্ট পাশ ও বলবৎ হওয়ার পর বাংলাদেশের কৃষককুল জমির স্বত্বাধিকারী হয়। নজরুল যে কত বড় দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান চিন্তানায়ক ছিলেন তা এ ঘটনা থেকে সহজেই প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য, তাঁর এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন তিনি তাঁর সুস্থাবস্থায় দেখে যেতে পারেননি।

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের কর্মনীতি ও সংকল্প সমাজের স্তূপীকৃত সমস্যার প্রেক্ষাপটে জন্ম নিয়েছিল এবং এর উল্লেখযোগ্য অনেক কর্মসূচী ছিল যা সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। ইস্তেহারে শ্রমিকের অধিকার, কৃষকের অধিকার সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, নজরুল জাতীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং তিনি প্রায় সারা বাংলা সফর করেছেন। নজরুল যে স্বপ্নচারী, আকাশচারী কোন কবি ছিলেন না, বরং তিনি যে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক ও সমাজ চিন্তাবিদ ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী পর্যালোচনায় এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

নজরুলের বাঙালি ও বাংলাদেশ বীক্ষণ ঃ

নজরুল বাঙালির জাতীয় কবি ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এজন্যে যে, তিনি বাংলার

মানুষের প্রাণের কথা, মনের কথা অত্যন্ত খোলামেলাভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি আধুনিক বাংলাদেশের জন্মের অনেক পূর্বেই বাংলার জনগণের শক্তিমত্তা ও অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা বারবার বলেছিলেন। তাঁর ভাষায় বাংলার ধন-সম্পদের কোন অভাব ছিলনা, কিন্তু বিদেশীদের দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনের অবাধ শিকারে পড়ে বাঙালি সম্পদহারা হয় আর বাংলাদেশ দরিদ্র হয়ে পড়ে। কিন্তু এতকিছুর পরও বাঙালি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেগে ওঠে তাহলে তার নবজাগৃতি অনিবার্য। তাঁর ভাষায় ঃ

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে -- 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্টসেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোন জাতির নেই। কিন্তু কর্মশক্তি একেবারে নেই বলে তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্মবিমুখতা, জড়তা, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনাশক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। আমাদের অভাব কোথায় ? অতিপ্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশী লুটে নিয়ে যায়। আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না উল্টো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লিখায় লিখিত।

..... তার (বাংলার) সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশী দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না, এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু একে স্পর্শ করবে --- তাকে প্রহারেণ

ধনঞ্জয় দিয়ে বিনাশ করবো, সংহার করবো। বাঙালিকে বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও ঃ

"এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির - আমাদের
দিয়া প্রহারেণ ধনঞ্জয়
তাড়াব আমরা, করিনা ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
রামাদের গামাদের।।"
বাঙলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক!

(বাঙালির বাঙলা)

উক্ত প্রবন্ধে নজরুল বাংলার সমস্যা তথা বাঙালির কি সমস্যা ছিল তার ওপর আলোকপাত করেছেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি তার আপন ঠিকানা খুঁজে নেয় এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। কিন্তু আজো আমরা দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে পারিনি। নজরুল যে বলেছিলেন অবিদ্যা অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় এটা সত্য কথা।

এখানো আমাদের সিংহভাগ লোকই অশিক্ষিত। উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অন্তরায় হয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি সত্য; কিন্তু এখনো আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাইনি। এখানো আমাদের অর্থনীতি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট। বিদেশ থেকে ভিক্ষার ঝুলি ভরে আমরা আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছি। নজরুল বলেছিলেন যে, বিদেশী দুস্যরা আমাদের সম্পদ ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। কথাটি আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থ ও খাদ্য সাহায্যের নামে বিদেশী সাহায্য সংস্থা ও দেশসমূহ কঠিন কঠিন শর্তারোপ করছে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর। সাহায্য যা পাওয়া যাচ্ছে তার সিংহভাগই আবার কনসালটেন্সিসহ বিভিন্ন কায়দায় বিদেশী সংস্থা ও দেশ দস্যুতা করে, ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। মোটকথা এখনো সমানহারে দস্যুবৃত্তি বলবৎ রয়েছে। সুতরাং নজরুলের বাঙালি ও বাংলাদেশ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, আজকের সমাজবাস্তবতার সাথে তার বহুলাংশেই মিল

রয়েছে। বাংলার সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা যথার্থ অর্থেই যেন দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত।

কালঘনিষ্ঠতা

নজরুলের উপন্যাস, ছোটগল্প, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, নাটক, প্রবন্ধ, অভিভাষণ ইত্যাদি লেখা থেকে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ব্যাপক পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে এবং তা গবেষণার দাবী রাখে। আলোচ্য নিবন্ধে খুবই সীমিত পরিসরে তাঁর রচনার ওপর আলোচনা করা হলো। তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের চিন্তাধারা নিয়েও ব্যাপক গবেষণা করা যায় যেখানে আমরা দেখি তিনি 'ধুমকেতু', 'গণবাণী', 'লাঙ্গল' সহ বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এসব পত্রিকায় স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জ্বালাময়ী নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। নজরুলের চিন্তাধারার আলাদা এক জগৎ এখানে পাওয়া যাবে।

বলা বাহুল্য, নজরুলের সামাজিক চিন্তাধারার প্রভাব তৎকালীন সাহিত্যাকাশে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল, এখনো হচ্ছে, আগামীতেও হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর কবিতা ও গান এদেশবাসীর অন্তরের জিনিষ বলে প্রতিভাত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কবিতা, গান ও রচনা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। নজরুল ব্রিটিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাটক কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন। শুধু তাই নয়, নজরুলের মুক্তচিন্তা ও মুক্তকণ্ঠের বাহন 'ধূমকেতু' পত্রিকাকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্বকবি লিখলেন ঃ

আয় চলে আয়রে 'ধুমকেতু'
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দূর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোকনা লেখা,

জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

নজরুল পরাধীন ভারতের মানুষের মনের কথা লিখেছিলেন। তাই তিনি জনগণের অপরিসীম ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান পেলেন, পেলেন গণসংবর্ধনা দেশের মানুষের পক্ষ থেকে। জীবদ্দশায় তিনি এতবেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন যা আর কোন কবির ভাগ্যে জোটেনি। তিনি বিপুল বেগে এলেন এবং জয় করলেন মানব হৃদয়। কারণ ওই একটাই, সমাজ সংশ্লিষ্টতা, মানবগহনে বসবাস ও এর অনুপম ইহজাগতিকতা। নজরুল তাই অজেয়, কালোত্তর।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশের সমাজ বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানীদের মতো পদ্ধতি অনুসরণ না করেও নজরুল তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহ যথার্থভাবে অনুধাবন করে তা তাঁর লেখায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের সমস্যা ও সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন যা নজরুল অনুসরণ করেছিলেন। সামাজিক নানাবিধ স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ, দারিদ্র্যের মুখোশ উন্মোচন, পরাধীনতার জাল ছিন্নকরণ, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন --- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনের দিক নির্দেশনা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিনাশন, নারীর প্রতি অযৌক্তিক অবরোধের বিলোপন, সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন এবং আত্মমর্যাদাশীল স্বাধীন জাতিসত্তার উদ্বোধনসহ সামগ্রিক সমৃদ্ধিতে নজরুলের সৃষ্টিসম্ভার শুধু বাংলায় নয়, বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

তথ্য নির্দেশিকা

নজরুল ইসলাম, কাজী (১৯৮৫), *সঞ্চিতা*। ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স।

মান্নান সৈয়দ, আব্দুল (১৯৮৭), *নজরুল ইসলাম ঃ কালজ কালোত্তর*। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

আব্দুল হাই, মুহম্মদ ও আলী আহসান, সৈয়দ (১৩৯৫), *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ (আধুনিক যুগ),* ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ।

আব্দুল হাকিম, শেখ (১৯৮৭), *নজরুল সাহিত্যে মানবতা ও ধর্ম।* ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

নজরুল ইসলাম, কাজী (১৯৯৬), *নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

নজরুল ইসলাম, কাজী (১৯৯৬), *নজরুল রচনাবলী (৪র্থ খন্ড)।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮), *নজরুল ইসলামের সাহিত্যজীবন।* ঢাকা ঃ মুক্তধারা।

Islam, Rafiqul (1990), ***Kazi Nazrul Islam a new anthology.*** Dhak : Bangla Academy.